ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. ওয়াহিদ আলম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
এ এস এম জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. রেযাউল করিম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
আতিয়া আফরিন, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন*
খালেদা আক্তার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন*
নাহিদ শারমিন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. শহীদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

কৃতজ্ঞতা
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য সব মুখ্য তথ্যদাতার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদনে মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা **অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ান-উল-আলম, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক মো. জসিম উদ্দিন ফেরদৌস, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এ প্রতিবেদনকে সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।**

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:
দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

সার-সংক্ষেপ*

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

'এজেন্ডা ২০৩০' বা 'এসডিজি' হিসেবে পরিচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ বৈঠকে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়। ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে এসডিজি কার্যকর হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এসডিজি'র মধ্যে মোট ১৭টি 'বৈশ্বিক অভীষ্ট' রয়েছে, এবং এসব অভীষ্টের মধ্যে ১৬৯টি লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব লক্ষ্যের অগ্রগতির নির্দেশক হিসেবে ২৪৪টি সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট' বা 'এমডিজি' থেকে এসডিজি'র মূল পার্থক্য হচ্ছে এটি এমডিজি'র সংখ্যাগত ধারণা থেকে গুণগত ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

এসডিজি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, এবং সূচক ২৩টি। এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের অগ্রগতি জানিয়ে 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা'র মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করতেও অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের অগ্রগতি প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসেবে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম উদ্দেশ্য। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি কেমন, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিশেষকরে এসডিজি ১৬ অর্জন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী তা চিহ্নিত করে সহায়তা করার জন্য এই গবেষণা হাতে নেওয়া হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় এসডিজি ১৬'র ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে চারটি লক্ষ্যের ওপর পর্যালোচনা (১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০) করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এসব লক্ষ্য নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যেও যেসব বিষয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় সেগুলোর ওপর পর্যালোচনা করা হয় নি।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে প্রধানত গুণগত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পরোক্ষ উৎস যেমন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সূচক, দেশভিত্তিক প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, জাতীয় তথ্যভাণ্ডার, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পর্যালোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী ও সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। **গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এপ্রিল - আগস্ট ২০১৭ সময়ের মধ্যে।**

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লক্ষ্যকে নিম্নলিখিত তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

- **প্রস্তুতি** - এখানে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য সংক্রান্ত আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেমন তা পর্যালোচনা করা হয়েছে;
- **বাস্তবতা - আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতা আলোচনা করা হয়েছে; এবং**
- **চ্যালেঞ্জ - প্রায়োগিক ঘাটতির কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।**

৪. এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ

* ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও তদারক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে মূল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এসডিজি তদারকির জন্য তথ্যের ঘাটতি বিশ্লেষণ করেছে, এবং এসডিজি তদারকি কাঠামো তৈরি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ফলাফলভিত্তিক তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য ওয়েবভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার পদ্ধতি ('এসডিজি ট্র্যাকার' নামে পরিচিত) স্থাপন করা হয়েছে। এসডিজি অর্জনকে মাথায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের চাহিদা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই চাহিদা অনুযায়ী ২০৩০ পর্যন্ত ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালের জন্য জাতিসংঘ দ্বারা নির্ধারিত কয়েকটি লক্ষ্যের ওপর জিইডি 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা' প্রতিবেদন তৈরি করেছে যা এ বছর জুলাই মাসে জাতিসংঘে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওপরের উদ্যোগ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজিও, নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও গণমাধ্যমের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। বেসরকারি অংশীজনের উদ্যোগে 'এসডিজি'র জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় এসডিজি অর্জন সংক্রান্ত সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫. এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগের চ্যালেঞ্জ

এসডিজি'র ২৪৪টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ২৪১টি। জিইডি'র তথ্যের ঘাটতির বিশ্লেষণ অনুযায়ী এর মধ্যে সরকারের কাছে ৭০টি সূচকের ওপর সম্পূর্ণ ও ১০৮টি সূচকের ওপর আংশিক তথ্য রয়েছে; বাকি ৬৩টি সূচকের ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই। দেখা যায় এসডিজি ১৬'র অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ও ঘুষ, সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের সন্তুষ্টি, বিচার-বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদির ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই, এবং কয়েকটি বিষয় যেমন অর্থপাচার ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের ওপর সরকারের কাছে আংশিক তথ্য বিদ্যমান। এসডিজি ১৬'র অন্তর্ভুক্ত দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্তকে সরকারের একাংশের অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দুর্নীতি ও ঘুষের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকার কতটুকু নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করবে যেখানে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশের জড়িত থাকার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে তা নিয়ে আশংকা বিদ্যমান। উপরন্তু দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর তথ্য সংগ্রহে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতেও সরকারের একাংশের প্রবল অনীহা বিদ্যমান।

লক্ষ্যভিত্তিক পর্যালোচনা

৬. লক্ষ্য ১৬.৪: "২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো, ব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলা করা"।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচক (১৬.৪.১) হচ্ছে দেশের ভেতরে ও বাইরে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে)।

৬.১ প্রস্তুতি

অবৈধ অর্থ প্রবাহ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫), এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ক পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), অপরাধী তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব ভিন্ন। এছাড়া অর্থপাচার প্রতিরোধ ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি, কার্যকর কমিটি, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অর্থপাচার সংক্রান্ত দুটি জাতীয় ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং দুটি খাতভিত্তিক (রিয়েল এস্টেট ও এনজিও) কাঠামোগত ঝুঁকি পর্যালোচনা সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কৌশল (২০১৫- ২০১৭) প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও অর্থপাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করছে; বাংলাদেশ 'এগমন্ট গ্রুপ'-এর সদস্য যেখানে ১৫২টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা ও রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো অফিসেস-এর সদস্য। আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্য ইতোমধ্যে ৫৫টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৬.২ বাস্তবতা

প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে দেশের ভেতরে অর্থপাচারের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের

পরিমাণ ১২০% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এই সময়ে পাচারকৃত প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১-২০১৬ সময়ে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের জমা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০১৫ সালে ৪,৬২৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৬ সালে ৫,৫৬০ কোটি টাকা - যদিও কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এর ৯৩% আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক লেনেদেনের ভিত্তিতে পাওনা। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অর্থ প্রবেশের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাইবার অপরাধীরা যে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করে তার মধ্যে ৮১ মিলিয়ন ফিলিপাইনে ও শ্রীলংকায় ২০ মিলিয়ন ডলার পাচার করে।

চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য খুব বেশি নয়। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭২.৮১ কোটি টাকা) বাজেয়াপ্ত, **২০১৬-১৭ সালে জরিমানা বাবদ ০.৩৪ মিলিয়ন ডলার (২.৭৩ কোটি টাকা)**, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া ৩৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তবে অর্থপাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। প্যারিসভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স-এর ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স-এর বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক - এই ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট ৬টি, বহুলাংশে কমপ্লায়েন্ট ২২টি, এবং আংশিক কমপ্লায়েন্ট ১২টির ক্ষেত্রে। ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স ২০১৭ অনুসারে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম।

অর্থপাচার প্রতিরোধে বেশকিছু কার্যক্রম চলমান। অর্থপাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিএফআইইউ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন সংস্থা থেকে সন্দেহজনক অর্থবিনিময় প্রতিবেদন (এসটিআর) সংগ্রহ করে আইন প্রয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। ২০১০-২০১৪ সময়ের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থপাচার, জঙ্গি অর্থায়ন, ওষুধপাচার, মানবপাচার, জুয়া, আত্মসাৎ, কর ও শুল্ক অবমুক্ত সংক্রান্ত ৩৮টি বৈদেশিক অনুরোধ পেয়েছে, অন্যদিকে ১৭টি অনুরোধ বিদেশে পাঠানো হয়েছে। অর্থপাচার মামলার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত দশটি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে দশটি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে ২২২টি মামলা এখন পর্যন্ত অনিষ্পন্ন রয়েছে।

৬.৩ চ্যালেঞ্জ

অর্থপাচার প্রতিরোধে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তার মধ্যে জাতীয় ও খাতভিত্তিক ঝুঁকি পর্যালোচনায় ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। দেখা যায় এই পর্যালোচনায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর রাজনীতিকরণ, দুর্নীতিতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আঁতাত, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের রাজনীতির সাথে ত্রিমুখী সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করা হয় নি। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থপাচারের ঝুঁকি, যেমন সাম্প্রতিক ঋণ কেলেংকারি, নির্বাহী কমিটি বা বোর্ডে রাজনৈতিক নিয়োগ যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক নয় এমন নির্দিষ্ট ব্যবসা বা পেশার (ডিএনএফবিপি) দ্বারা অর্থপাচার কিভাবে হতে পারে সে সংক্রান্ত ঝুঁকি ও ধারণায় ঘাটতি রয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলে কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সহায়তার দিক-নির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও ট্রাস্ট আইন ১৮৮২-তে কোম্পানি ও ট্রাস্টগুলোর জন্য 'বেনামী মালিকানা' সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয় নি।

অর্থপাচার প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়। কোনো কোনো নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে (যেমন দুদক, এনবিআর) সক্ষমতা ও নির্দিষ্ট মামলা পরিচালনা ইউনিটের অনুপস্থিতির কারণে অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও নিষ্পত্তিতে ঘাটতি রয়েছে, যেমন রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, তদন্তের শুরুতে কার্যকরভাবে অর্থপাচার সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য যাচাই না করা, এবং অবৈধ অর্থের উৎস সন্ধান ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অর্থপাচার মামলা পরিচালনায় আদালত ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া ডিএনএফবিপিগুলোর তদারকিতে ঘাটতি, এবং অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক যাচাইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতিও রয়েছে।

৭. লক্ষ্য ১৬.৫: "সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা"।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচকগুলো হচ্ছে - বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে - এমন মানুষের অনুপাত (সূচক ১৬.৫.১); এবং বিগত

১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করা হয়েছে - এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (সূচক ১৬.৫.২)।

৭.১ প্রস্তুতি

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আইন, নীতি ও কৌশল বিদ্যমান। এসব আইনের মধ্যে দণ্ডবিধি, ১৮৬০, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ উল্লেখযোগ্য। এসব আইনে দুর্নীতি সংক্রান্ত কার্যক্রম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় বিভিন্ন কৌশলপত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রূপকল্প ২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর, অনুসমর্থন করেছে ও পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

এসব আইন প্রয়োগের জন্য দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিস (ওসিএজি)। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য দুদক ও বিচার বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদা নির্ধারিত যার মাধ্যমে আইনগত ক্ষমতা, নির্ধারিত কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন, এবং তথ্য কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীরা বেসরকারি অংশীজন হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুদকের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধ, শনাক্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন সহযোগীসহ অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণ।

বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা; উপহার, সুবিধা, এবং বন্ধুত্ব; স্বজনপ্রীতি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সংসদ সদস্যদের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক (আরপিও), এবং এটি সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য, এবং লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কথা।

একইভাবে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেখানে ক্ষমতা/ প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বিনিয়োগ করা; সরকারি কর্মচারীদের আওতার মধ্যে পড়ে এমন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি বছরশেষে সম্পদের বিবরণী ঘোষণা করতে হবে, এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান ও তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইন প্রণীত হয়েছে।

সরকারি ক্রয় ও চুক্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬-এ ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমা উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বেসরকারি খাত থেকে দরদাতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৭.২ বাস্তবতা

তবে যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানা পর্যায়ে কী পরিমাণ ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় তা নিয়ে টিআইবি নিয়মিতভাবে দেশব্যাপী জরিপ করে আসছে। দেখা গেছে ধারাবাহিকভাবে খানা জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উচ্চ। সর্বশেষ খানা জরিপে (২০১৫) দেখা গেছে জরিপকৃত খানার ৬৭.৮% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে সেবা পেতে ৫৮.১% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকেও বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান নিম্ন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ২০১৬ সালের দুর্নীতির ধারণাসূচকে (শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে) বাংলাদেশের পয়েন্ট ২৬, এবং ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম ছিল। এই সূচকে বাংলাদেশ সবসময়ই উচ্চ-দুর্নীতিপ্রবণ দেশের শ্রেণীভুক্ত ছিল। বিশ্ব ব্যাংক-এর ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ১৮.৮। গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাংকিং ২০১৪ অনুসারে অবৈধ অর্থ প্রদান ও ঘুষের ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের স্কোর ২.৩ (৭ এর মধ্যে), এবং অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১৪০তম। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর ২০১৬'র তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রাক্কলিত অর্থমূল্য জিডিপি'র ৫ শতাংশ। অন্যদিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য (২০১৫) অনুযায়ী এটি জিডিপি'র ২-৩ শতাংশ।

বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। দেখা যায় অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করার হার কম, এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তির হারও কম। এছাড়া দুর্নীতির তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে প্রাপ্ত ১২,৫৬৮টি অভিযোগের মধ্যে ১,৫৪৩টি অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়, যেখানে **এর আগের বছরগুলোতে গড়ে ১,০২০টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়েছিল।** প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে ৫৪৩টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৩৫৯টি অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভ সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত ও ঘুষ নেওয়ার জন্য ১৩ জনকে আটক ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বেড়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দুদক প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক গণশুনানি আয়োজন শুরু করেছে ২০১৫ সাল থেকে। এছাড়া নির্বাচিত ২৫টি খাত ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ নিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য সম্প্রতি হটলাইন চালু করেছে।

৭.৩ চ্যালেঞ্জ

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় - বিদ্যমান আইনে কয়েকটি বিভাগের কর্মচারীদের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশ করতে সরকারি কর্মচারীরা বাধ্য নন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবসর গ্রহণের পর একই খাতের বেসরকারি কোনো চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কতদিন ব্যবধান থাকতে হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন। বাংলাদেশে 'লবিইং' সংক্রান্ত কোনো আইন বা নীতি নেই। গোপন তথ্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য আইন ও নীতিমালায় কোনো মানদণ্ডের উল্লেখ নেই। জনস্বার্থ সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পেশাগত বাধ্যবাধকতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তথ্য প্রকাশকারী কোনো সমস্যায় পড়লে তার প্রতিকার, অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ, কার্যকর ও সময়োপযোগী পদ্ধতির উল্লেখ নেই। একক উৎস থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় ও চুক্তি আইনে সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ সীমার উল্লেখ নেই। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বেনামী মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। এবং সরকারি ক্রয়ে গোপন আঁতাত বন্ধ করার জন্য কোনো বিধান নেই।

এছাড়া দুদকের দুর্নীতিবিরোধী কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা নেই। সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য নয়, এবং কতজন কর্মচারী সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করে নি তাদের কোনো পরিসংখ্যান নেই। সরকারি কর্মচারীদের প্রকাশিত সম্পদের বিবরণীর কোনো অনলাইন ডেটাবেইজ নেই যার মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থা এ তথ্য যাচাই করতে পারে। সরকারি কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী যাচাই করা, তথ্য প্রকাশকারীদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একই রকম তথ্য প্রকাশ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায়, এবং এ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়নও সীমিত।

৮. লক্ষ্য ১৬.৬: "সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ"।

এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত সূচক হচ্ছে খাতভিত্তিক (বা বাজেট কোড বা অনুরূপ কোন বিষয় ভিত্তিক) অনুমোদিত মূল বাজেটের তুলনায় প্রাথমিক সরকারি খরচের অনুপাত (সূচক ১৬.৬.১), এবং সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত (সূচক ১৬.৬.২)।

এ গবেষণায় পর্যালোচনার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলোকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও খাতের মধ্যে রয়েছে ১. সংসদ, ২. নির্বাহী বিভাগ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য), ৩. বিচার বিভাগ, ৪. স্থানীয় সরকার, ৫. জনপ্রশাসন, ৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ৭. নির্বাচন কমিশন, ৮. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি), ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ১০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ১১. তথ্য কমিশন, ১২. রাজনৈতিক দল, ১৩. গণমাধ্যম, ১৪. নাগরিক সমাজ / এনজিও, এবং ১৫. ব্যবসা খাত।

৮.১ প্রস্তুতি

গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা যায় সকল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। একদিকে সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে দুদক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ও তথ্য কমিশনকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে৷ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সংবিধানে কর্তৃত্ব নির্ধারিত করা হয়েছে৷ নাগরিক সমাজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট আইনে বৈধতা দেওয়া হয়েছে৷ এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত রয়েছে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও দুদকের ক্ষেত্রে৷ সংসদ (২০১২- ২০১৪), মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (২০১৩-১৮), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (২০১৬-২০), এবং তথ্য কমিশন (২০১৫-২১) কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে৷

অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ও খাতে সেবার মান উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রকল্প ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে৷ মাঠ পর্যায়ে অটোমেশন সফটওয়ারের ব্যবস্থা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-ফাইলিং ব্যবস্থার জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে৷ ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃক ই-ট্রাফিক পুলিশ পদ্ধতির প্রবর্তন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে অপরাধ তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, পুলিশ স্টেশনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এবং জেলা পর্যায়ে 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে৷ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৬'র ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওয়েব-নির্ভর রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার, অনলাইন ভোটার নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে স্মার্ট কার্ড বিতরণ চলমান রয়েছে৷ সিএজি কার্যালয়ে ডিজিটাল নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে৷ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন চালু করা হয়েছে৷ কেন্দ্রীয় ই-সেবা হিসেবে নথি, ই-তথ্যকোষ, জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে৷ শুদ্ধাচার উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭ প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নৈতিকতা কমিটি গঠন, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দুদকের 'সততা ইউনিট গঠন' উল্লেখযোগ্য৷

এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়৷ যেমন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নাগরিক সনদ প্রবর্তন করা হয়েছে৷ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেটের প্রবর্তন করা হয়েছে৷ জেলা ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক গণশুনানির প্রবর্তন করা হয়েছে৷ দুদকের পক্ষ থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন করা হয়েছে, এবং সেবা খাত নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে৷ জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে৷ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন, নিউজলেটার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে৷ এছাড়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও কার্যকর হয়েছে৷

দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উদ্যোগের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, ভাল কাজের জন্য জেলা প্রশাসকদের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ এবং 'জনপ্রশাসন পুরস্কার নীতি' প্রণয়ন করা উল্লেখযোগ্য৷

৮.২ বাস্তবতা

ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ নয় বলে গবেষণায় দেখা যায়৷

সংসদে বিরোধীদলের ভূমিকা দুর্বল৷ আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত বলে লক্ষ করা যায়৷ স্থায়ী কমিটিগুলোর বেশিরভাগই নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক করে না, এবং কমিটিগুলোর সক্রিয়তা ও কার্যকরতার ঘাটতি রয়েছে৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান৷ সংসদে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা হয় না এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়েও কোনো আলোচনা হয় না৷ সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হলেও অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার সীমিত৷ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময় আর্থিক তথ্য প্রকাশ করলেও নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের বার্ষিক আর্থিক তথ্য প্রকাশ করেন না৷ নির্বাচন ছাড়া জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, এবং সংসদের বাইরের কার্যক্রমের জন্যও তাদের দায়বদ্ধতা নেই৷ কোনো কোনো স্থায়ী কমিটির সদস্যের 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' বিদ্যমান৷

নির্বাহী বিভাগের ক্ষেত্রে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন। প্রায় সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব লক্ষ করা যায়৷ সরকার প্রধান বা মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেন না। নিরীক্ষা সংক্রান্ত আপত্তি কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রণালয় বা বিভাগ আমলে নেয়। এছাড়া কর্মী পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এখনো প্রবর্তিত হয় নি। কোনো কোনো মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যবসায় তার নির্বাহী পরিচয় ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

মামলা জটের কারণে বিচার বিভাগের কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ঐ সময়ে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩১,৩৯,২৭৫। অধস্তন আদালতে সেবা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিচারক ও বিচার বিভাগের কর্মীদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অধস্তন আদালতের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক চলমান।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দ, ক্রয় ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। উপজেলা ও জেলা পরিষদ এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়। স্থানীয় সেবা প্রদানে 'দল-কেন্দ্রিক' মেরুকরণ ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর সরকার ও সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মেয়রদের বরখাস্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর স্থানীয় সরকার বিভাগের তদারকিও দুর্বল।

জনপ্রশাসনে সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দকরণ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দক্ষ জনবলের ঘাটতিও রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। পদোন্নতি ও পদায়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকরতাও প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। গত দশ বছরে দেশে অপরাধ সংঘটনের হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে বলে দেখা যায়। এসব সংস্থার বিরুদ্ধে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, বিনা বিচারে আটকে রাখা ও গুমের অভিযোগ থাকলেও বিচার-বহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না, এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত ও মামলা করা হয় না । এছাড়াও ঘুষ, দুর্নীতি ও আইনের অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে অস্বীকৃতির ঘটনাও অনেক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না।

সর্বশেষ মেয়াদের নির্বাচন কমিশন অবাধ, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় প্রায় নির্বাচনে সহিংসতা ও জাল ভোটের ব্যাপকতা ছিল। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় যাচাই করে না, রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের তৎপরতার ঘাটতি রয়েছে, এবং নির্বাচনী দায়িত্ব ও নীতিমালা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা বিদ্যমান। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়।

সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রত্যেক বছর সম্পন্ন করতে পারে না, এবং তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই করতে পারে না। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না, এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সিএজি'র নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ বলে অভিযোগ রয়েছে।

দুর্নীতির মামলার দীর্ঘসূত্রতা, মামলা পরিচালনায় দুর্বলতা এবং মামলায় শাস্তির হার খুব কম থাকার ফলে প্রতীয়মান যে দুর্নীতি দমন কমিশন এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারে নি। দুদকের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এখনো কার্যকর নয়। দুদকের তদন্ত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, এবং দুদকের কোনো বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা নেই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এই কমিশনের অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট অনেক। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনের প্রধান ও কমিশনারদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে আয়-ব্যয়ের তথ্য হালনাগাদ নয়, এবং বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

তথ্য কমিশনেও অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট বিদ্যমান। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনারদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তথ্য কমিশনের বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি বিদ্যমান, যেখানে দলীয় প্রধানের কাছে আনুগত্য-নির্ভর দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতিতে এখন পেশীশক্তি ও অর্থের প্রাধান্য বেশি। প্রায় সব দলই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করে। নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকারকে নিজেদের দলের অংশ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রায় সব দলেই তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্যে অস্বচ্ছতা রয়েছে। প্রায় সব দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনের নিয়মকানুন না মানার অভিযোগ রয়েছে।

গণমাধ্যমগুলোতে ব্যবসায়ী-রাজনীতিক মালিকানার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় দ্বারা বিভক্ত। সংবাদ প্রতিবেদনে স্ব-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। গণমাধ্যমগুলোতে আয় এবং ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, এবং বেশিরভাগ গণমাধ্যমে ওয়েজ বোর্ড মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

নাগরিক সমাজ এবং/অথবা এনজিও খাতও অনেকক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত। বেশিরভাগ এনজিও'তে প্রকল্প-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রাধান্য রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিও খাত বিদেশী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, এবং অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় দাতার ভাবধারা বা প্রাধান্য অনুযায়ী পরিচালিত বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ মানসম্মত নয়। অনেকক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অপারগতা লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থা দুর্বল, এবং সুবিধাভোগীদের কাছেও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা হচ্ছে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা। এছাড়া নাগরিক সমাজের মত প্রকাশের ক্ষেত্র বর্তমানে সীমিত।

বাংলাদেশের ব্যবসা খাতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে অশুভ যোগসাজশ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কার্য-সম্পাদনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর রাজনীতিকীকরণের মাধ্যমে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতাও বিদ্যমান। মুনাফা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ব্যবসায় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্রমিক সংগঠন রোধের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া কাজের পরিবেশ উন্নত করা ও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশ পালনে ঘাটতি বিদ্যমান।

৮.৩ চ্যালেঞ্জ

আইনে বিদ্যমান ঘাটতির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলা চিহ্নিত করা যায়। যেমন, জাতীয় সংসদে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যার ফলে তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা পাওয়া যায় না। নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করার জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অনুপস্থিতি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন জনপ্রশাসন আইন নেই, এবং পুলিশ আইন যুগোপযোগী নয়। মন্ত্রী, তাদের সমান পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গ ও সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধিমালা নেই। সিএজি'র কর্মকর্তাদের জন্য স্বার্থের সংঘাত বিষয়ক বিধিমালা নেই। উচ্চ আদালতের বিচারক, নির্বাচন কমিশন, সিএজি'র নিয়োগে যথাযথ যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্য বাছাইয়ের মানদণ্ড ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নেই। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তৃত্ব প্রদানের কারণে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। আইন সীমাবদ্ধতার কারণে সংসদ সদস্য, নির্বাচন কমিশন, সিএজি, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্যদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে।

দলীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই বলে লক্ষ করা যায়। যেমন, সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার ভূমিকা ও প্রশাসনের ক্ষমতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন অপর্যাপ্ত। **স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক বরখাস্ত করার ক্ষমতা** বিদ্যমান। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন বাজেট ও প্রশাসনিক জনবলের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬-এর মাধ্যমে যথাক্রমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। **প্রশাসন**, **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে** নিয়োগ; বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব প্রচ্ছন্ন।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুদক, ওসিএজি, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসা, গণমাধ্যম, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার ঘাটতি, এবং বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এনজিওগুলো'র দাতা-নির্ভরতা, এবং গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের সুযোগ সীমিত। এছাড়া সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারে সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাজেট পূর্বানুমানে দুর্বলতা রয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান।

৯. লক্ষ্য ১৬.১০: "জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে, তথ্যের প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষাকরণ"।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচক হচ্ছে বিগত ১২ মাসে সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট মিডিয়া কর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের এবং মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা, গুম, বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং নির্যাতনের সংখ্যা (সূচক ১৬.১০.১)।

৯.১ প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে মৌলিক কিছু স্বাধীনতা যেমন আইনের চোখে সমতা, জীবন ও জীবিকার অধিকার, চিন্তা ও বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা, সংঘ ও সভা/ সমাবেশ করার স্বাধীনতা, ধর্মচর্চা, আন্দোলনের স্বাধীনতা, এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধিকার (যেমন তথ্য অধিকার) সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন (আংশিক/ সম্পূর্ণভাবে) করেছে। এর মধ্যে UDHR (মানবাধিকার), ICCPR (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার), CRC (শিশু অধিকার), CEDAW (নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ), UNCRMW (অভিবাসী কর্মীর অধিকার), ILO Conventions (শ্রমিক অধিকার) উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে তথ্যে **উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে** প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই আইনে তথ্যের সংজ্ঞা, আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য সময়মতো না পেলে আপিল করার ব্যবস্থা, অগ্রহণযোগ্য আবেদনের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশনার ন্যূনতম মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৫-২০২১' প্রণয়ন এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশন নির্দেশিকা, ২০১৪ জারি করা হয়েছে।

৯.২ বাস্তবতা

যথাযথ আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এখনো চলার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১৯৫ জন, এবং ২০১৫ সালে ১৯২ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ৯৭ জন ব্যক্তিকে গুম, অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১ জন, ২০১৫ সালে ৫ জন সাংবাদিক / ব্লগার হত্যার শিকার হয়েছেন।

তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে দেশের স্কোর এবং রেটিং মাঝামাঝি। ফ্রিডম ইন দি ওয়ার্ল্ড রেটিং (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৪৭, যার অর্থ "আংশিক উন্মুক্ত"। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৪৮.৩৬, এবং অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং (২০১৬) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১৫০ এর মধ্যে ১০৭ পয়েন্ট, এবং অবস্থান ১১১টি দেশের মধ্যে ২৪তম। বাংলাদেশে তথ্যের আবেদন প্রাপ্তির তুলনায় তথ্য সরবরাহের হার সন্তোষজনক - তথ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে ৬,১৮১টি আবেদনের মধ্যে ৫,৯৪০ জন আবেদনকারীকে (৯৬%) তথ্য সরবরাহ করা হয়। সারাদেশের সবগুলো জেলা ও উপজেলায় প্রায় ২১,০০০ জন তথ্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিগুলোতে বিশেষকরে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯.৩ চ্যালেঞ্জ

জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষণীয়। এসব ঘটনা তদন্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনীহা সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে প্রতীয়মান, এবং তদন্তের ফলাফল প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি দেখা যায়। তথ্য ও মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো কোনো আইনের কয়েকটি ধারার অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন, জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারার উদ্বেগজনক অপব্যবহার, এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ অভিব্যক্তি এবং বেসরকারি সংস্থার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। এছাড়া 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এবং 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন', 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অ্যাক্ট', 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট'-এর প্রস্তাবিত খসড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধ বাড়াবে বলে আশংকা করা হয়।

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এসডিজি ১৬-এর লক্ষ্যগুলোর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিপুষ্ট। তবে একদিকে কোনো কোনো আইনে দুর্বলতা রয়েছে, আবার অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের ঘাটতি রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সীমিত বা চর্চায় ঘাটতি রয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার লক্ষ করা যায়। দলীয় বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ হয় বলে দেখা যায়।

বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও ঘুষ, অর্থপাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয় এবং কার্যকর না হওয়ার পেছনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনের আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কোনো কাঠামো নেই, এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থাও দুর্বল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পর্যাপ্ত নয়।

১১. সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ নিচে উপস্থাপন করা হলো।

১১.১ আইনি সংস্কার

১. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে, এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
২. সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অনুমোদন দিতে হবে।
৩. অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিল করতে হবে।
৪. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৫. পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য পুলিশ আইন ১৮৬১ সংস্কার, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে।
৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করতে হবে।
৭. নির্বাচন কমিশনের গঠন, কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা দিতে হবে।
৯. তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১০. তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে।
১১. বৈদেশিক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে।

১১.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১. **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন, এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. **আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. **অর্থপাচার প্রতিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুদক, এনবিআর, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থপাচার তদন্ত ও মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ইউনিট থাকতে হবে; অর্থপাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং চিহ্নিত করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

৪. **প্রণোদনা:** প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে।

১১.৩ প্রায়োগিক পর্যায়

১. **বেজলাইন জরিপ পরিচালনা:** জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেশব্যাপী বেজলাইন জরিপ বিবিএস-এর মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বা নাগরিক সমাজ কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বয় প্রয়োজন।

২. **লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় এসডিজি ১৬-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে ২০৩০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা / মাইলফলক নির্ধারণ করা প্রয়োজন (যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে কতটুকু দুর্নীতি ও ঘুষ কমাতে হবে, বা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের হার কতটুকু বাড়াতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা)।

৩. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. **দুর্নীতির মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি:** দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময়ানুগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া:** সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলন করতে হবে।

৬. **বিচার-বহির্ভূত হত্যার তদন্ত:** সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

****